

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হলেও পরে তারা আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। এদের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এক সময় তারা ক্ষমতা দখল করে নেয়। বাংলায় ইংরেজদের শাসন চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এভাবে ১৭৫৭ সালের পরে বাংলায় যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত আমরা তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলি। আর ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলকে ঔপনিবেশিক যুগ বলি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উপনিবেশ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তার ও অবসানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় ইংরেজ শাসনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব;
- বাংলার জাগরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ- ১ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন

উপনিবেশিকরণ একটি প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশ অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে তাকে নিজের দখলে আনে। অধীনস্ত দেশটির জনগণ, সম্পদ সবকিছুই অধিপতি দেশটি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করে। এখানে দখলকৃত দেশটি দখলকারী দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়। বাংলা প্রায় দুইশ বছর এমনভাবে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই শাসনের সূচনা হয়েছিল যা নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে শেষ হয়। কীভাবে এই ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়েছিল তা জানার আগে সেইসময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা কিছুটা জেনে নেয়া দরকার।

বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি: ঔপনিবেশিক শাসন পূর্বকাল

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে মানব বসতির কথা জানা যায়। এ অঞ্চলটি বরাবরই ছিল ধনসম্পদে পূর্ণ একটি এলাকা। ফলে ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই এখানে বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। সকলের আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার অর্থনৈতিক প্রাচুর্য। কাজেই বহিরাগতের আগমন বাংলার ইতিহাসের নতুন কোনো ঘটনা নয়।

খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বহিরাগত আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বাংলায় প্রবেশ করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোক। সে সময় পুন্ড্রনগর (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি) হয় মৌর্যদের প্রদেশ। মৌর্যদের পর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য। চার শতকে উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব-বাংলার কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। গুপ্তদের পতনের পর সপ্তম শতকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম বাঙালি শাসক শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গ নামে আরেকটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তবে শশাঙ্কের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। তার মৃত্যুর পর একশো বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় মাৎস্যন্যায় যুগ। এরপর বাঙালিদের দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আট শতকের মাঝ পর্বে। প্রায় চারশো বছর বাংলাকে শাসন করেন বাঙালি পাল রাজারা। পালদের পতনের পর এগারো শতকের শেষ দিকে আবার বিদেশি শাসনের অধীনে চলে যায় বাংলা। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আসা সেন রাজারা বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন।

সেন শাসনের অবসান ঘটে বাইরে থেকে ভাগ্যান্বেষণে আগত তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাতে। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে ছোট্ট একটি অংশ দখল করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। ১২০৪ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল। নদীয়া ও উত্তর বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার পূর্বাঞ্চল (বিক্রমপুর) আরও অনেক সময় পর্যন্ত সেন শাসকদের অধীনে ছিল। বিহার অভিযানে ব্যর্থতার পর ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজি মারা যান। তবে তাঁর মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি সুলতানদের শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তারপর ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে।

এ সময়ের মধ্যে বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের তিনটি প্রদেশ বা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগগুলো উত্তর বাংলায় লখনৌতি, পশ্চিম বাংলায় সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁও নামে পরিচিত ছিল। ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়। তবে সমগ্র বাংলার এক বৃহদাংশ অধিকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার মাধ্যমে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধরা হয়। ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' ও 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' উপাধি ধারণ করেন। এভাবে তিনিই প্রথম বাঙ্গালা শব্দটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন। স্বাধীন সুলতানি আমলের অপর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা শিল্প, সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান অপরিমিত। যাহোক, ১৫৩৮ সালে অবসান ঘটে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের। অবশ্য এর আগেই মোগল শক্তি দিল্লির সিংহাসন দখল করেছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ সালে উত্তরবাংলার গৌড় অর্থাৎ লখনৌতি দখল করলেও বাংলায় তখন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এর কারণ, বিহারের আফগান শাসক শের খান হুমায়ুনকে প্রথমে বাংলা ও পরে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন। এ পর্বে অবাঙালি আফগানদের হাতে চলে যায় বাংলার সিংহাসন।

ভারতে মোগলরা আবার সংগঠিত হয় এবং রাজমহলের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এরপর সম্রাট আকবরের সময় ১৫৭৬ সালে পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার অনেকটা অংশ মোগলদের অধিকারে আসে। বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অংশ সহজে মোগলরা দখল করতে পারে নি। বারোভুঁইয়া নামে পরিচিত পূর্ববাংলার জমিদাররা একযোগে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কয়েকবার চেষ্টা করেও বারোভুঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১০ সালে মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি চূড়ান্তভাবে বারোভুঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করেন এবং তৎকালীন দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করেন। এভাবেই বাংলায় মোগল অধিকার সম্পন্ন হয়। এই মোগল শাসন চলে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। সেই সাথে বাংলার ক্ষমতা দখল করে আরেক ইংরেজ শক্তি। আর এভাবেই শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন।

কাজ-১ : ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

কাজ-২ : খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত বাংলার শাসকদের পর্যায়ক্রমিক তালিকা তৈরি করো।

পাঠ- ২ : বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার

ইউরোপের কোনো কোনো দেশে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার এবং কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে অর্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল। এর ফলে চৌদ্দ শতক থেকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য-বিপ্লবের সূচনা হয়। তখন একদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে শুরু করে। অন্যদিকে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্যে বাজারের সন্ধানও শুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা সমুদ্র পথে বাণিজ্য বিস্তারের অন্বেষণে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্রমান্বয়ে এই প্রতিযোগিতায় সামিল হতে থাকে। এই লক্ষ্যে সতেরো

শতকে একে একে ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (হল্যান্ড), ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইত্যাদি বাণিজ্যিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। আবার তার মধ্যে বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে।

পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। ক্রমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পর্তুগিজদের চেয়ে ইংরেজদের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। এছাড়া ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমাররাও বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে। এই বিদেশি বণিকদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা কেমন ছিল তার কিছুটা হদিস মিলে বিদেশি পর্যটকদেরই বর্ণনায়। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৬৬ সালে লিখেছেন, ‘ওলন্দাজরা তাদের কাশিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে কখনো কখনো ৭শ থেকে ৮শ লোক নিয়োগ করত’। ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির বণিকরাও এরকম কারখানা চালাত। বার্নিয়ের আরও লিখেছেন, ‘শুধুমাত্র কাশিমবাজারে বছরে ২২ হাজার বেল সিল্ক উৎপাদিত হতো।’

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ইউরোপের বণিকরা দেখলো বাংলায় স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেই বেশি লাভ করা সম্ভব। জব চার্লক নামক জনৈক ইংরেজ প্রতিনিধি ১৬৯০ সালে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর নামে গ্রাম ক্রয় করেন যা পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত হয়। এই কলকাতাই এক সময় ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আর এদের মাধ্যমে বাংলা থেকে পুঁজিও পাচার হতে থাকে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং কুট কৌশলে পারদর্শী হবার কারণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশঃ অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর তুলনায় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায় এবং তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। তারা এখানে কুঠি, কারখানা তৈরি ও সৈন্য রেখে ব্যবসার অধিকার পায়। ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় দিল্লির সম্রাট ফাররুখশিয়ারের কাছ থেকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যসহ আরো একাধিক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সুবিধা প্রাপ্তিতে। এইসব সুবিধাদি তাদের দিনে দিনে উচ্চাভিলাষী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী করে তোলে। পলাশি যুদ্ধের আগে এবং মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়। এ সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সর্বস্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন।

কাজ-১ : ভারতবর্ষে যে সকল ইউরোপীয় শক্তির আগমন হয় তার তালিকা তৈরি করো।

কাজ-২ : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কীভাবে বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটায়?

পাঠ- ৩ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়

আগেই বলা হয়েছে যে ইংরেজরা ক্রমশঃ ক্ষমতা আকাজ্জী হয়ে উঠেছিল। ফলে বাংলার নবাবদের সাথে এদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এই সময় তাঁর সামনে একদিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের সামলানোর কঠিন কাজ, পাশাপাশি বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও (বণিক শ্রেণি) সক্রিয় ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটান সাথে সাথে বড় ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে প্রভাবশালী দেশীয় বণিকসমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় এরা ছিল প্রধানতঃ রাজপুতানা থেকে আসা মারওয়াড়ি বণিক। এদের মধ্যে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নবাবের বিপরীতে একাধিক দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজরা গোপনে জোট বাঁধে। শাসনকাজে নবাবের অদক্ষতা বিরোধী পক্ষের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। এরই সবশেষ ফল হলো ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আশ্রয়লাভে পলাশির যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয় ও নির্মম মৃত্যু এবং ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন। বিজয়ের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাব বানাতে, মূল ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। ধূর্ত ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ হন সর্বসর্বা। তবে ১৭৬৪ সালে বঙ্গারের যুদ্ধে মীর জাফরের উত্তরসূরী মীর কাশিমের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার শাসন ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়।

বাংলার প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটি ভিনদেশী বানিজ্যিক কোম্পানি তথা ঔপনিবেশিক শক্তির এই বিজয়ের কারণ কী ছিল? এর পিছনে নানাবিধ কারণ থাকলেও কয়েকটা প্রধান কারণ হলো-

১. বাংলার শাসকদের দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এবং তা মোকাবিলায় তরুণ অনভিজ্ঞ নবাবের অপারগতা;
২. উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে ইংরেজদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের কূট কৌশল বোঝার মতো পারদর্শী দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শক্তির অভাব;
৩. ইংরেজদের উন্নত সামরিক শক্তি, রণকৌশল ও নেতৃত্ব;
৪. অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার প্রজাদের সাথে শাসকদের দূরত্ব এতটাই ছিল যে নবাবের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাংলার সাধারণ মানুষ ছিল নির্বিকার। প্রজাদের এই নিষ্ক্রিয়তা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের সুবিধা দেয়।

কাজ-১ : পলাশীর যুদ্ধ কী?

কাজ-২ : বাংলায় ইংরেজরা কেন জয়লাভ করেছিল?

পাঠ-৪ ও ৫ : ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ

এদেশে ইংরেজ শাসনামল মূলতঃ দুইটি পর্বে বিভক্তঃ

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনামল (১৭৬৫-১৮৫৭)

খ. ব্রিটিশ সরকারি শাসনামল (১৮৫৮-১৯৪৭)।

বঙ্গারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈতশাসন ছিল একটি অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের উপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির উপর। এর ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

দ্বৈতশাসন ছিল এদেশের মানুষের জন্য এক চরম অভিশাপ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের অর্থের লালসা দিন দিন বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা সে সময় দেশে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেলেও কোম্পানি করের বোঝা কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসে এটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এদেশে একাধিক গভর্নর ছিলেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রমুখ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। যেমন : যোগাযোগ- রেল, ডাক ও তার ইত্যাদি।

ইংরেজ শাসকদের গৃহীত প্রধান প্রধান কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইনে বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়।
২. ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হয়।
৩. রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

৪. মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে রূপান্তর করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতাই হয় বাংলার রাজধানী।

তবে এই সময়ে ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন। এ ছাড়া সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনসহ সামাজিক কুপ্রথা নিবারণে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালিদের উদ্যোগকে তারা সহযোগিতা দেন। এভাবে দেশে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণি ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ইংরেজ কোম্পানির শাসনে প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দখল পেয়েই ক্ষান্ত ছিল না। দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোটোবড়ো নবাব ও দেশীয় রাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এর ফলে দিল্লির মসনদও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কোম্পানির সেনাবাহিনী নানা দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

১৮৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এ বিদ্রোহ দমন করে। এরপর ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়, যার মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ভারত শাসন আইনের ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে ভারতসচিব পদে (Secretary of State for India) মনোনীত করা হয়। যিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারত শাসনের ব্যবস্থা করবেন। এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ সালে ভারত সরকারকে বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১২ জন ছিল। ১৮৯২ সালে ২১ জন করা হয়। শুরুতে এই সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল না। পরে ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে উঠে এবং এ ধারাই বাংলাসহ সারা ভারতে প্রচলিত হয়। তবে আইনসভার উপর ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল ছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলার সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় জমিদার ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও এককালের সমৃদ্ধ তাঁতশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। বাংলার বণিক গোষ্ঠী তেমন সংগঠিত ছিল না, শিল্পেও

বাংলার অবস্থান তখন উল্লেখ করার মতো নয়। সামাজিক অনুশাসনের দাপটে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে পিছিয়ে ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। ব্রিটেন ছিল সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান ধনী দেশ। গোটা ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ অর্থাৎ শোষণের ক্ষেত্র।

কাজ-১ : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ব্যাখ্যা করো।

কাজ-২ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ভারত ইংরেজদের দ্বারা কীভাবে শাসিত হয়?

পাঠ-৬ ও ৭ : ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: বাংলার নবজাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটা বাড়তি লক্ষ্য ছিল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে রাজ্য হারানো ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সম্ভ্রষ্ট করা। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্যে ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, বিধান সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হলো, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হলো। এদেশে এ সময় জ্ঞানচর্চায় সীমিত কিন্তু কার্যকর জোয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কর্মভূমিকা ছাড়াও নানা সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, স্কুল টেক্সট বোর্ড গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সারাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কিছু কলেজও স্থাপন করে। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনও বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি পথ খুলে দেয়। এর ফলে বইপুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও স্থায়িত্ব দেওয়ার পথ সুগম হয়। এ সময় সংবেদনশীল মানুষের নজর যায় সমাজের দিকে। সমাজের অনাচার নিয়ে যেমন তাঁরা আত্মসমালোচনা করেছেন তেমনি শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসে অনেকে।

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। আবার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামের অবদানও ব্যাপক।

বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলের আধুনিক শিক্ষা ও জাগরণের আরেকটি দিক হলো দেশপ্রেমে

উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। সেই সাথে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বোধেরও উন্মেষ ঘটতে থাকে।

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পিছনে। যদিও ইংরেজ শাসকদের বক্তব্য ছিল দেশের কল্যাণ। এ সময় বাংলার সীমানা ছিল অনেক বড়। পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে ছিল বৃহত্তর বাংলা। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল। এ কারণে পূর্ব বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উন্নয়ন সম্ভব হয় নি। ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে প্রস্তাব রাখেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করা হবে। ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ করা হবে। এই প্রদেশের নাম হবে ‘পূর্ব বঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই প্রদেশ শাসন করবেন।

যুক্তি থাকলেও বস্তুতঃ এর মধ্য দিয়ে বাংলায় ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বিভক্ত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বাংলাকে ভাগ করার মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসকরা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেয়েছে বলে মনে করা হয়। কারণ, পূর্ববাংলার বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান। তাই মুসলমান নেতারা ভেবেছেন নতুন প্রদেশ হলে পূর্ব বাংলার উন্নতি হবে। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এ কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড় নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। তারা মুসলমান নেতাদের সাথে পরামর্শ না করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলমান নেতাদের মধ্যে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারে মুসলমানদের দাবি আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের অভিসন্ধি অনেকটা সফল হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য বাঙালি হিন্দু নেতারা একের পর এক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশদের ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

স্বাধীকার আন্দোলন

বাঙালিরা বিনা প্রতিবাদে ইংরেজ শাসকদের কখনোই মেনে নেয় নি। গোটা ইংরেজ শাসনামল জুড়ে বাংলা ও ভারতে নানা প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ আসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। দীর্ঘ সময় ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, নির্যাতন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে। বাংলায় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ও হাবিলদার রজব আলী এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সিপাহীদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলায় নানা আন্দোলন শুরু হয়। এর মধ্যে রয়েছে- স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, স্বরাজ এবং সশস্ত্র আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিলেতি পণ্য, শিক্ষা বর্জন এবং দেশীয় পণ্য, শিক্ষা প্রচলনের মতো আরো নানাবিধ কর্মসূচি নেয়া হয়। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। সশস্ত্র এই বিপ্লবী তৎপরতা অল্প-বিস্তর উত্থান পতনের মধ্যে প্রায় ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। এদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, মাষ্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার প্রমুখ বিপ্লবীরা। এরা প্রত্যেকেই দেশের জন্য আত্মহুতি দিয়েছিলেন। প্রীতিলতা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ। পাশাপাশি বাংলাসহ ভারতব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে চলেছিল নানাবিধ নিয়মতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ের এসব আন্দোলনে যুক্ত বাঙালি নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- নেতাজি সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখরা। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য কারণ থাকলেও নানা ধরনের ধারাবাহিক এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপেই ব্রিটিশরা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পাঠ-৮ : লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

বাংলা তথা ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারে ভীত ইংরেজ শাসকরা শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কর্মকাণ্ডে নানাভাবে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির প্রয়োগ ঘটাতে থাকে। ইতোপূর্বে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তা ইংরেজদের প্ররোচনায় ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপ নিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের উচ্চবিত্ত অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্বের ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধিও অনেকটা দায়ী ছিল। ফলে চলমান জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটতে থাকে। ক্রমশঃ কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে, যদিও কংগ্রেসে অনেক বড় মাপের মুসলমান নেতা ছিলেন। যাহোক বিভেদের রাজনীতির ফলে হিন্দু, মুসলমান নেতা ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ধারণাই কাজ করতে থাকে। ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। যার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সাথে অবসান ঘটে প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের। ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলাও দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়- মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়; আর হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম-বাংলা ভারতের সাথে যুক্ত হয়। তবে এভাবে বাংলা ভাগ করাকে বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হিন্দু, মুসলমান নেতারা একইভাবে মেনে নেন নি। শরৎ বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চেষ্টা করেছিলেন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও তা পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠতে পারে নি।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগণকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হয়।

কাজ-১ : বাংলায় সমাজ সংস্কারক ১০ জন মনীষীর নাম উল্লেখ করো।

কাজ-২ : বাংলায় নবজাগরণে কোন কোন প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

কাজ-৩ : বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ব্যাখ্যা করো।

কাজ-৪ : ভারত বিভক্তির কারণ ব্যাখ্যা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

- | | |
|----------------------|---|
| ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা | খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ |
| গ. নবাব আলীবর্দি খাঁ | ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি |

২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বছরকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়। কারণ তখন-

- দেশে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত।
- বড়মাছ ছোট ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলত।
- শাসকবর্গ সুশাসনে অক্ষম ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

২/০/২

আশার দাদু তাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন যে, বাংলার নবাবকে শাসন কাজের জবাবদিহি করতে হতো। তাকে এ কাজে অর্থের জন্য অন্য একটি কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী থাকতে হতো।